মেরী কুরী

[১৮৬৭—১৯৩৪]

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর ওয়রশতে মেরীর জন্ম। বাবা ক্রোদোভস্কা ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে ওয়ারশ হাইস্কুলে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। মেরির মা ছিলেন একটি মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। এছাড়া খুব ভাল পিয়ানো বাজাতেন। চার বোনের মধ্যে মেরীই ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। অকস্মাৎ তাঁর পরিবারের উপর নেমে এল দুর্যোগের ঝড়। যক্ষ্মারোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মা। বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। ঈশ্বর বোধহয় খুশি হলেন মাকে তার শিশুদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে। মেরীর বয়স তখন মাত্র দশ।

পোল্যাণ্ড তখন জার শাসিত রাশিয়ার অধিকারে। পোল্যাণ্ড জুড়ে শুরু হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলন। গোপনে এই আন্দোলনে সহায়তা করবার জন্য স্কুলের চাকরি হারাতে হল মেরীর বাবাকে। অনেক চেষ্টা করেও অন্য কোথাও চাকরি পেলেন না। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেদের মনোবল হারাননি ক্রোদোভস্কা পরিবার।

মেরী কিন্তু তাঁর পড়াশুনায় ছিলেন অসম্ভব মনোযোগী। শুধু নিজের ক্লাস নয়, সমগ্র স্কুলের তিনি ছিলেন সেরা ছাত্রী। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক পেলেন।

কিন্তু অত্যধিক পড়াশুনার চাপে শরীর ভেঙে গিয়েছিল মেরীর। বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মেরীকে পাঠিয়ে দেয়া হল গ্রামের বাড়িতে।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল। দেহ মন সতেজ হয়ে ওঠে মেরীর। আবার ওয়ারশ-তে ফিরে এলেন। মেরীর ইচ্ছা ছিল ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর অনুরোধ অবজ্ঞা করল।

সেই সময় তাঁর বোন প্যারিসের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। মেরীর ইচ্ছা সেও বোনের সঙ্গে গিয়ে পড়াশুনা করবে।

বড় বোন গেলেন প্যারিসে। তখন একমাত্র প্যারিসেই মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে পারত। বোনের পড়ার খরচ মেটাবার জন্য গভর্নেসের চাকরি নিলেন মেরী।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। মেরীর বাবার আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। মেরীর বড় বোন তাঁর এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। তারা মেরীকে আমন্ত্রণ জানাল প্যারিসে।

নিজের সামান্য সঞ্চিত কিছু অর্থ আর পিতার কাছ থেকে পাওয়া অর্থ নিয়ে মেরী রওনা হলেন প্যারিসে। সেখানে গিয়ে উঠলেন বোনের বাড়িতে। ভর্তি হলেন প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অল্প কয়েক মাস যেতেই এক সমস্যা দেখা দিল মেরীর জীবনে। পড়াশুনার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বোনের বাড়িতে সারাদিন গানবাজনা বন্ধু-বান্ধবদের আসা-যাওয়া।

মেরী স্থির করলেন কলেজের কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবেন। প্রথমে প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেরীর ইচ্ছাকেই মেনে নিলেন তাঁর বোন-দুলাভাই।

শুরু হল সাধনা আর সংগ্রাম। আরামের জীবন ত্যাগ করে নিজের খরচ চালাবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিলেন। আয় বলতে নিজের সামান্য সঞ্চয় আর বাবার পাঠানো যৎসামান্য অর্থ, সব মিলিয়ে মাসে ৪০ রুবল।

শিক্ষকেরা মেরীর কল্পনাশক্তি, উদ্যম ও দক্ষতা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে নতুন নতুন গবেষণায় উৎসাহিত করতেন। গভীর আত্মবিশ্বাসে মেরী স্থির করলেন শুধু পদার্থবিদ্যা নয়, অঙ্কতেও তিনি ডিগ্রী নেবেন। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হল না। তিনি প্রথমে পদার্থবিদ্যা (১৮৯৩), পরের বছর অঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

এই সময় একদিন পরিচয় হল পিয়ের কুরীর সাথে। পিয়ের ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। কোন নারী নয়, বিজ্ঞানই ছিল তাঁর জীবনের আকর্ষণ।

একদিন দুজনের দেখা হল এক অধ্যাপকের বাড়িতে। তারা দু'জন বিজ্ঞান নিয়েই কথাবার্তা শুরু করেছিলেন এবং তাদের অজান্তেই পরস্পরের বন্ধু হয়ে যান।

পিয়ের মেরীকে তাঁর গবেষণাগারে যোগ দিতে বললেন। পিয়ের তখন চুম্বকত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। মেরী তাঁর সাথে কাজ শুরু করলেন (১৮৯৪)। পরের বছর দুজনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

সেই সময় পিয়ের স্কুল অব ফিজিক্সে মাত্র ৫০০ ফ্রাঙ্ক মাইনে পেতেন। এই অর্থেই দুজনের সংসার চলত। স্বামীর ল্যাবরোটারিতে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটত মেরীর।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল একদিন বিরল ধাতু ইউরেনিয়ামের একটি অংশ লবণ দিয়ে পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করলেন ঐ লবণ থেকে এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি বার হয় যা অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করে যেতে পারে। তিনি দেখেছিলেন এই অদৃশ্য রশ্মি একটা কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফির প্লেটের উপরও বিক্রিয়া করে। কোন রশ্মির ভেদ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্ভবত এটাই প্রথম আবিষ্কার।

এই ব্যাপারটি কুরী দম্পতির গোচরে আনেন বেকেরেল। তাঁরা অন্য গবেষণা ছেড়ে এই সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তারা স্থির করলেন এই বিষয়টিকেই তাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার জন্য গবেষণার বিষয় হিসাবে স্থির করবেন।

পিচব্লেণ্ডের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় মেরী নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন মাস গবেষণাগার ছেড়ে বিশ্রাম নিলেন।

১৮৯৭ সালে মেরীর প্রথম সন্তান আইরিনের জন্ম হল। সন্তান জন্মের পর কিছুদিন গবেষণা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে বাধ্য হলেন মেরী। আইরিনের বয়স কয়েক মাস হতেই গবেষণার কাজে আবার স্বামীর সঙ্গী হলেন মেরী।

১৮৯৮ থেকে ১৯০২ এই ৪৫ মাস অমানুসিক পরিশ্রম করেছেন স্বামী-স্ত্রী। দিনমজুরের মত খাটতেন মেরী। আটচালার নীচে তাঁর স্বামী নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডুবে থাকেন।

প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন পিচব্লেণ্ডের মধ্যে শতকরা একভাগ অন্তত অদৃশ্য বস্তুটি পাওয়া যাবে। এখন সে সব চিন্তা কোথায় হারিয়ে গেল। নতুন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা এত বেশি যে অশোধিত আকারের মধ্যে তার অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিতিও সত্যি বিস্ময় জাগাত। মূল আকারের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে যে, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিসটি উদ্ধার করাই হল কঠিন কাজ।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছর গড়িয়েই যেতে লাগল। পিয়ের-মেরী হতাশ হলেন না—সেই অদৃশ্য পদার্থ তাঁদের মুগ্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত সাধনায় জয়ী হলেন কুরী দম্পতি। একটির পরিবর্তে দুটি নতুন মৌল পদার্থ আবিষ্কার করলেন।

বিদেশে থেকেও নিজের জন্মভূমির প্রতি মেরীর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। তাই নিজের দেশ পোল্যাণ্ডের নাম অনুসারে একটি দ্রব্যের নাম রাখলেন পলোনিয়াম। দ্বিতীয়টির নাম রাখা হল রেডিয়াম।

কুরী দম্পতি প্রমাণ করলেন কোন কোন মৌলের পরমাণু ক্রমাগত ভেঙে গিয়ে রশ্মি বিকিরণ করে। এই বিকিরণ অন্য পদার্থ ভেদ করেও যেতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে বলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর এই গুণকে বলে তেজস্ক্রিয়তা। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, পলোয়াম—তিনটিই তেজস্ক্রিয় মৌল।

তাঁদের সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে এলেন সুইডেনের নোবেল কমিটি। ১৯০৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হল সেই বছর পদার্থবিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক বেকেরেলকে আর অর্ধেক মঁসিয়ে ও মাদাম কুরীকে তাঁদের রেডিও এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হবে।

মেরী দম্পতি তাঁদের গবেষণা শুরু করেছিলেন সামান্য একটি ডক্টরেট ডিগ্রী পাবার আশায়...কিন্তু পথের শেষে তাঁরা পেলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার।

প্রচলিত নিয়ম এটাই যে নোবেল পুরস্কার বিজেতাদের সশরীরে সুইডেনে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কুরী দম্পতি তখন এতখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে সুইডেনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। নোবেল কর্তৃপক্ষের তরফে ফ্রান্সে এসে তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হল।

এই অসাধারণ সম্মান পেয়েও কুরী দম্পতির জীবনধারার সামান্যতম পরিবর্তন হল না। নোবেল প্রাইজের অর্থ দিয়ে প্রথমেই তাঁরা গবেষণা চলাকালীন ঋণ পরিশোধ করলেন। অবশিষ্ট অর্থ গবেষণার জন্য ব্যয় করলেন।

১৯০৪ সালে পিয়ের কুরীকে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল এবং গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত হলেন। মাদাম কুরীকে তাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হল।

এই সময় কুরী দম্পতির কাছে প্রস্তাব এল রেডিয়াম নিষ্কাষণের পদ্ধতির পেটেন্ট নেবার জন্য। কুরী দম্পতি যদি পেটেন্ট নিতেন তাহলে বিশাল অর্থের মালিক হতে পারতেন, কারণ এক গ্রাম রেডিয়ামের মূল্য তখন ১৫০,০০০ ডলার। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কৃত পদার্থ থেকে অর্থ উপার্জন করতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, রেডিয়াম আবিষ্কার হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তাই তা সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বলা হল ফ্রান্সের মন্ত্রী সভার পক্ষ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হবে, পিয়ের কুরী লিখলেন, আমাদের তরফ থেকে মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা সম্মান চাই না। আমাদের প্রয়োজন শুধু একটি ভাল ল্যাবরেটরির।

কুরী দম্পতির সুদীর্ঘদিনের স্বপ্ন অবশেষে সফল হল। ফ্রান্স সরকারের পক্ষ থেকে একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ল্যাবরেটারি তৈরি করে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে মেরী দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের মা হলেন। মেয়ের নাম রাখা হল ইভ। আনন্দে ভরে উঠল কুরী পরিবারের সকলের মন। বিধাতা বোধহয় মেরীর জীবনের আনন্দ সহ্য করতে পারলেন না।

১৯শে এপ্রিয় ১৯০৪ সাল। সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। পিয়ের কুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটা অধিবেশনে যোগ দিয়ে সেখান থেকে এক প্রকাশকের কাছে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ বৃষ্টিভেজা পিছল পথে পা হড়কে পথের মাঝে পড়ে গেলেন। পেছন থেকে একটা মালবাহি গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা মারল। রক্তাক্ত পিষ্ট হয়ে পথের মাঝেই মারা গেলেন পিয়ের কুরী।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে সাময়িক ভেঙে পড়লেন মেরী। কিন্তু অল্পদিনেই ধীরে ধীরে নিজেকে মানসিক দিকে থেকে প্রস্তুত করে তুললেন। নতুন এক শক্তি জেগে উঠল তাঁর মধ্যে মনে হল স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজকে সমাপ্ত করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ মাদাম কুরীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করলেন এবং গবেষণা কাজের সমস্ত ভার তাঁর অর্পণ করা হল।

স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৫ই নভেম্বর ১৯০৬ সালে তিনি পিয়েরের উত্তরাধিকারী হিসাবে বিজ্ঞান একাডেমিতে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন সকলে।

শুরু হল মেরীর নতুন এক জীবন। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তারই সাথে অধ্যাপনা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সেরে দুটি মেয়ে আর বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-যত্ন করা। ১৯১০ সালে শ্বশুর মারা গেলেন। ছেলের সমাধির পাশেই বাবাকে সমাধিস্থ করা হল।

এই বছরেই তিনি রেডিয়াম ক্লোরাইডকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রেডিয়াম নিষ্কাষণ করলেন। এই অসাধারণ উদ্ভাবনের জন্য ১৯১১ সালে নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ তাঁকে রসায়নের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করল। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি দু'বার এই পুরস্কার পেয়েছেন।

বহু অর্থব্যয়ে তৈরি হল কুরী ইন্সটিটিউট। এর পরিচালনার ভার দেওয়া হল মেরী কুরীর উপর। এখানে রেডিয়াম বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য গবেষণার কাজ চলবে।

প্যারিসে মেরীর কর্মভূমি হলেও নিজের জন্মভূমিকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর আন্তরিক সাহায্যে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশতেও গড়ে উঠল রেডিয়াম গবেষণাগার।

আশৈশব অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্রমশই মেরীর দেহ অক্ষম হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তবুও কাজের বিশ্রাম ছিল না। দিন অতিক্রান্ত হচ্ছিল ক্রমশই চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছিল মেরীর।

কিন্তু ল্যাবরেটারি ছেড়ে ছুটি নেবার দিন ক্রমশই এগিয়ে আসছিল আর মনের মধ্যে কোন দুঃখ নেই বিষাদ নেই। দুই মেয়েই উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। বড় মেয়ে আইরিন গবেষণা করছে। (মেরীর মৃত্যুর এক বছর পর আইরিন জোলিও ও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জোলিও কুরী রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।

একদিন গবেষণাগার থেকে ফিরে এসে মেরী বিছানায় শুয়ে পড়লেন, আপন মনেই তিনি বললেন, "আমি বড় ক্লান্ত।"

পরের দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। দেশের সেরা ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করেও রোগ নির্ণয় করতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত রোগের কারণ জানা যায়নি। এটি ছিল রেডিয়ামের বিষ। তাঁরই আবিষ্কৃত সন্তান সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই এই মহিয়সী বিজ্ঞানসাধিকার জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হল।